গিরগিটি

সুব্রত হালদার

অমূল্যবাবু বিষম খেলেন। তাঁর মতো কড়া পুলিশ অফিসারের মুখের ওপর শকুন বলার সাহস কারও

দেখলে কেউ বলবে, এত বড় একজন অফিসার! সাদামাটা ছাপোষা মধ্যবিত্ত বলেই মনে হয়। অথচ ইউনিফর্মটা যখন গায়ে চড়বে এই লোকই বিলকুল বদলে যাবেন। ঠিক যেন ফোল্ডিং ছাতা। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জেলার শ্রীঅমূল্য হাতি। চোর ডাকাত অপরাধীরা ছায়া দেখলেও কাঁপে। কোনও কম্প্রোমাইজের ধার দিয়েও হাঁটেন না। অথচ এখন, দেশি শাঁকালু শেপের থলথলে ভুঁড়িটার উপর লুঙ্গি চাপিয়ে ফিনফিনে একটা ফতুয়া পরে কেমন নিরীহ গোবেচারার মতো বাজার করছেন।

অমূল্য হাতি সবে বদলি হয়ে বর্ধমানে এসেছেন। কাল সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছেন। আজ রবিবার ছুটি। কালকেই চার্জ নেবেন বর্ধমান জেলের। গতকাল বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে অনেক দৌড়ঝাঁপ গিয়েছে। তার ওপর সন্ধ্যা নাগাদ সপরিবার কোয়ার্টারে পৌঁছে গোছগাছের ধকল।

অঙ্কন : সঞ্জীবন বসু

তাই আজ রবিবার আরাম করে কাটাবেন মনস্থির করলেন। সকাল সকাল বাজারটা সেরে এলে তবেই সারা দিনের ছুটি। এই বাজার করাটা যতটা না প্রয়োজন তার থেকে বড় তাঁর নেশা। এই নিয়ে অনেকে আড়ালে-আবডালে হাসাহাসি করে সেটা উনি জানেন। তিনিই বোধহয় একমাত্র জেলার যিনি নিজে হাতে বাজার করেন। অধস্তন এতগুলো কর্মচারী। একবার আমতা আমতা করেও ইচ্ছেটা প্রকাশ করলে তাঁর বাজার করে দেবার জন্য অধস্তনদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে সেটা অমূল্যবাবু জানেন। হয়তো অ-মূল্যেই সেটা হবে। তার ওপর জেল কম্পাউন্ডে কয়েদিদের কর্মকুশলতায় যে আলুটা-মুলোটা ফলছে তার সিংহভাগই তো তাঁর রান্নাঘরে এসে পৌঁছনোর কথা। কিন্তু অমূল্যবাবুর এই এক দোষ।

—তাই বলুন, সোজা দু মিনিট হাঁটলেই রাস্তার বাঁ পাশে।

বাজারটা অমূল্যবাবুর বেশ পছন্দ হল। কলকাতার মতো ম্যাড়মেড়ে রংকরা সবজি আর পেটগলা অঙ্কের মাছ না। শাকসবজি বেশ টাটকা। এখনও মাটির গন্ধ লেগে আছে। মাছগুলোও বেশ চকচকে আর টাটকা। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে সকালে ধরা। শুধু কাতলার ঝাঁকের দিকে চোখ পড়তেই সলিড মেজাজটা বায়বীয় হয়ে গেল। এটা ছোটবেলা থেকেই হয়, সেই যখন থেকে কারণে-অকারণে ওই অবলা প্রাণীটি তাঁর রেফারেন্স হয়ে উঠত।

লোভে লোভে বাজারটা একটু বেশিই হয়ে গেল। একটা

তাঁর মতো কড়া পুলিশ অফিসারের মুখের ওপর শকুন বলার সাহস কারও আছে সেটা তিনি ভাবতেও পারেন না। অবশ্য এটা উনি জানেন আড়ালে অনেকে শকুন বলে। কয়েকটা বেনামি চিঠিও পেয়েছেন।

নো কোরাপশন। নো কম্প্রোমাইজ।

এই প্রথম বর্ধমানে আসা। সুতরাং বাজারটা যে কোন দিকে সেটাও অমূল্যবাবুর জানা নেই। বাজারের নামটা শুনেছিলেন, কিন্তু সেটাও ঠিক মনে পড়ছে না। কী একটা লেক বাজার যেন, হয়তো কোনও লেক বা বড় পুকুরের পাশে হবে। রাজারাজড়াদের জায়গা ছিল বর্ধমান তাই লেক আর রাজবাড়ির ছড়াছড়ি হওয়াই স্বাভাবিক। বাজারের ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভাবলেন রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যাবে। কিছু দূর হাঁটার পরে একটা তেরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেন এবার জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যাক, না হলে ভুল পথ ধরলে ঘুরে মরতে হবে। সামনেই একটা পান-সিগারেটের দোকান। দেওয়ালে লেপটে সলমন। পোস্টারটার কোনা খুলে ঝুলে পড়ায় মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বাইসেপেই পরিচয়। কয়েকজন খদ্দের ভিড় করে আছে, আর পানওয়ালা দুলে দুলে পান সাজছে।

অমূল্যবাবু সামনে গিয়ে বললেন, ভাই লেক কোথায়?

পানওয়ালা পান সাজতে সাজতেই হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেটের প্যাকেট অমূল্যবাবুর সামনে রেখে আবার পান সাজায় মন দিল।

অমূল্যবাবু আবার বললেন, ভাই লেক?

পানওয়ালা এবার সজাগ হল। কী বললেন, লেক?

—হ্যাঁ।

—ও আমি শুনলাম ফ্লেক, এই বলে সিগারেটের প্যাকেটটা আবার তুলে যথাস্থানে রেখে দিল। পাশের জমায়েতের দু'-চারজন ফিক করে হেসে উঠল।

—কোথায় ভাই বলতে পার?

—আমার দোকানে তো নেই।

এবার পাশ থেকে বেশ জোরে জোরেই হাসি।

হালকা হাওয়ায় পোস্টারটা ছটফট করে উঠল। এবার অমূল্যবাবু মুখটা দেখলেন, হাত্বিক। বুঝলেন বয়স বাড়ছে। উঠতি বয়সের কোনও ছেলে হলে বাইসেপ দেখেই নির্ভুলভাবে বলে দিত সলমন না হাত্বিক।

অমূল্যবাবু ওদের মশকরা গায়ে মাখলেন না। উনি জানেন দু'দিন পরেই ওঁকে দেখলে এদের কী হাল হবে। সিগারেট, পান নিয়ে পিছন পিছন ঘুরবে সাহেবকে তুষ্ট করতে।

ওদের একজন বোধহয় অমূল্যবাবুর হাতে বাজারের ব্যাগটা খেয়াল করল। বেশ ভদ্রভাবেই বলল, আপনি কি বাজার খুঁজছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ছিলই, আর একটা চটের থলিও কিনতে হয়েছে। এখন টানতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। বয়সটা তো কম হল না। পঞ্চাশ পেরিয়েছে তাও বছর চারেক হল। এখনও এত ধকল সহ্য হবে কেন? বাজার থেকে বেরিয়েই মোড়ের মাথায় একটা বটগাছ। চারধারে শানবাঁধানো চাতাল। চাতালে ব্যাগ দুটো রেখে একটু বসলেন। হিসেব করে নিতে হবে হেঁটে যাওয়া যাবে, না রিকশা নিতে হবে। এমন সময় খেয়াল করলেন একজন ষণ্ডামার্কা লোক তাঁর দিকেই আসছে। লম্বায় ছ' ফুটের ওপর। গায়ের রং কালো-সাদার বর্ডার লাইনে যেটা পাত্রী চাই কলামের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে। এই বয়সেও গাট্টাগোট্টা চেহারা। একমাথা কুচকুচে কালো চুল কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কপালে একটা লম্বালম্বি কাটা দাগ।

লোকটা এসে বলল, স্যার ব্যাগ দুটো পৌঁছে দেব?

—না, না, সে কি! আমিই নিতে পারব। দরকার হলে একটা রিকশা—

—ডাকব স্যার? রিকশা?

—না, না, একটু বিশ্রাম করে নিই তারপর ভেবে দেখব।

—আমার ব্যাপারটাও একটু ভেবে দেখবেন স্যার। একটু ম্যানেজ করে নেবেন।

এতক্ষণে অমূল্যবাবুর খেয়াল হল লোকটা তাঁকে প্রথম থেকেই স্যার স্যার করছে। তাঁর পরিচয় তো এখনও কারও জানার কথা না। ভাল চেহারার লোক দেখলে অকারণেই স্যার স্যার করা অনেকের স্বভাব। একটু খুশি হলেন এই ভেবে যে, চেহারায় তাহলে তাঁর একটা আভিজাত্য আছে, স্ত্রী আর কন্যা তো এটা মানতেই চায় না। তাও যাচাই করে নেবার জন্য বললেন, আপনি আমাকে চেনেন?

—কী বলছেন স্যার, আপনাকে চিনব না!

কথাটায় অমূল্যবাবু একটু দুঃখই পেলেন। তাহলে চেহারা না, পদমর্যাদা! সে তো কনস্টেবলকেও অনেকে স্যার স্যার করে এটা অমূল্যবাবু দেখেছেন। একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, কী করে চিনলেন?

—খবর ছিলই স্যার। কালকেই আসলেন দেখলাম। কোয়ার্টারের সামনে মাল নামাচ্ছিলেন।

অখুশি মনেই স্বগতোক্তি করলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছ। তারপরেই টনক নড়ল। আপনাকে দেখব মানে? নাম কী আপনার?

—গোপাল স্যার। শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার।

—গোপাল? ফাটা গোপাল নয় তো?

—আড়ালে বলে স্যার। সামনে বললে বডি ফেলে দেব না? সে তো আপনাকেও আড়ালে শকুন বলে স্যার। সেকথা ছাড়ুন।

অমূল্যবাবু বিষম খেলেন। তাঁর মতো কড়া পুলিশ অফিসারের মুখের ওপর শকুন বলার সাহস কারও আছে সেটা তিনি ভাবতেও পারেন না। আড়ালে অনেকে শকুন বলে এটা অবশ্য উনি জানেন। কয়েকটা বেনামি চিঠিও পেয়েছেন। যাতে ওঁকে 'প্রিয় শকুন' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অমূল্যবাবুর মনে পড়ে গেল এখানে আসার আগে একটা রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন তাতে প্রথমেই যে বন্দির নাম ছিল সে গোপাল মজুমদার, ওরফে কাটা গোপাল। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তুই তো এখনও বিচারাধীন বন্দি। জেলের কয়েদি।

এক লাফে আপনি থেকে তুইতে ন্যস্ত করলেন।

—হ্যাঁ স্যার। তিন বছর হয়ে গেল। কালতু একটা কেসে টেসে দিয়েছে স্যার।

—বুঝলাম না।

—মার্ডার কেস স্যার। নিতাইয়ের মার্ডার কেস। কিন্তু বিশ্বাস করুন নিতাইকে আমি মারিনি।

—ঠিক বুঝলাম না?

—ওপর থেকে চাপ ছিল স্যার। শালপাড় রেল ইয়ার্ড নিয়ে হেভি ক্যাচাল চলছিল। কালীতলা থানার বড়বাবু এনকাউন্টারে নিতাইকে ফেড়ে দিল। সেই রাতেই আমাকে অ্যারেস্ট করে নিতাইয়ের মার্ডার কেসটা আমার ঘাড়ে ফেলে দিল। তারপর প্রমোশন নিয়ে ফুট না হলে দেখে নিতাম।

—ঠিক বুঝলাম না।

বিরক্তি মেশানো গলায় কাটা গোপাল বলল, এখনও বুঝলেন না স্যার। এই হল গিয়ে পুলিশে চাকরির মুশকিল। কাগজ ছাড়া কিছু বোঝে না। শিক্ষিত হয় তো, তাই ছাপা কাগজ আর গাঁধীমুণ্ডুতে অগাধ ভক্তি।

অপমানটা অমূল্যবাবু হজম করে নিলেন এই জন্যে যে, ব্যাপারটা ওঁকে বুঝতেই হবে।

—তা নয়, আমি বুঝছি না যে তুই জেলে বন্দি অথচ এখানে কী করে এলি!

—ও এই ব্যাপার। সেটাই তো বলতে এসেছি স্যার। একটু দেখবেন। সবই তো বোঝেন। জেলের সবাই জানে।

—কী জানে?

মনে মনে কাটা গোপাল বলল, ন্যাকা, দর বাড়াচ্ছ চাঁদু। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, আমার হয়ে আর একজন আমারই সাকরেদ প্রক্সি দিচ্ছে স্যার। আপনার আগের জন সব ঠিকঠাক চালিয়ে এসেছে। আপনি আর ক্যাচাল বাঁধাবেন না। আগে যা দিতাম সেটাই পৌঁছে দেব। ঠিক এক তারিখেই পেয়ে যাবেন।

এতক্ষণে ব্যাপারটা অমূল্যবাবুর কাছে পরিষ্কার হল, কিন্তু রেকর্ড?

—সব টু দ্য পারসেন্ট আছে স্যার, কেউ ধরতেই পারবে না। নামটাই শুধু আমার, কিন্তু হাইট ফিগার বয়স এমনকী ফটোও সব আমার সাকরেদের সঙ্গে মিলে যাবে।

—কিন্তু কপালে এই কাটা দাগ। যার জন্য তোর নাম কাটা গোপাল...

—ওটাও মিলে যাবে স্যার। ওর কপালেও আছে। এই লাইনে আস্ত কপাল আর কার আছে স্যার, সবারই ফাটা কপাল।

—কিন্তু তুই যা করছিস সেটা তো অপরাধ, পাপ।

—কীসের পাপ স্যার? কেষ্ট করলে পাপ হয় না আর আমরা করলেই পাপ? দুটোই তো অন্যায়-অবিচারের কেস স্যার!

—কেষ্ট? কোন কেষ্ট?

—বা! বাড়িতে ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন আর এমন ভাব করছেন যে চেনেনই না!

—ছবি, আমার বাড়িতে? মুখ সামলে কথা বল। ওসব কেষ্ট-ফেষ্ট আমি চিনি না, বুঝলি।

গোপাল কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, ওভাবে বলতে নেই স্যার, পাপ হবে।

অমূল্যবাবুর এতক্ষণে বোধোদয় হল, তাড়াতাড়ি কপালে জোড়হস্ত প্রণাম ঠুকে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিলেন। পরক্ষণেই স্বমূর্তি ধরলেন, আমাকে এত সহজে বশে আনা যাবে না, বুঝলে বাছাধন! এক্ষুনি তোকে অ্যারেস্ট করাব।

ফাটা গোপাল ভয় পেল না, হাসতে হাসতে বলল, পারবেন না স্যার। ফাটা গোপাল বলে দুটো লোককে কী করে এক সঙ্গে জেলে রাখবেন স্যার! ফেঁসে যাবেন। আগে প্রমাণ করুন জেলের গোপাল আসল গোপাল না।

অমূল্যবাবু চিন্তা করে দেখলেন কথাটা ঠিকই। তাহলে?

—স্যার একটা রিকশা ডেকে দিচ্ছি, বলে গোপাল হাঁটা লাগাল। একটু পরেই একটা রিকশা এসে অমূল্যবাবুর সামনে দাঁড়াল।

পরদিন কাজে যোগ দিয়ে নিয়মমাফিক চেনা-পরিচিতির পর কেয়ারটেকারকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। একথা-সেকথার পর সরাসরি প্রসঙ্গে এলেন, জেলে কটা গিরগিটি আছে? কেয়ারটেকার বুঝলেন নতুন জেলার ফিট লোক। এসে প্রথমেই যখন গিরগিটি অনুসন্ধানে নেমেছেন তখন হিসেবিই হবেন। আগে মাস গেলে হাজার সত্তর উঠত, এবার সেটা লাখ ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে, খুশিখুশিভাবে বলল, আগে গোটা পাঁচেক ছিল, এখন মোটে তিনটে। তবে আরও গোটা ছয়েকের অফার আছে আপনি যদি অনুমতি দেন তো।

—নাম কী?

—ফাটা গোপাল, সমাদ্দারবাবু আর বিপ্লব কর্মকার।

—ঠিক আছে, ফাটা গোপালকে নিয়ে আসুন আর ফাইলটা পাঠিয়ে দিন।

অমূল্যবাবু প্রতিজ্ঞাটা আর একবার মনে মনে আউড়ে নিলেন। নো করাপশন, নো কম্প্রোমাইজ। জেলের মধ্যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা যদি না করতে পারি তবে নিজের নামের মধ্য থেকেও ওটা ছেঁটে দেব।

একটু পরেই কেয়ারটেকার যে লোকটিকে নিয়ে প্রবেশ করল তার সঙ্গে অমূল্যবাবুর দেখা গোপালের জমিন-আসমান তফাত। দেখে মনে হচ্ছে বয়স কম করে পঞ্চান্ন হবে। বড়জোর সাড়ে চার

ফুট হাইট। হেরোইন আর চোলাইতে শরীরের দফারফা হয়ে গিয়েছে। হাড়জিরজিরে চেহারার ঘাটের মড়া। কপালে কমলার কোয়ার শেপের কাটা দাগ। চোখগুলো কলকাতার বাজারের পাবদার মতো। কিন্তু অবাক হলেন ফাইলের বর্ণনার সঙ্গে চেহারার অদ্ভুত মিল। লোকটা এসে প্রায় ঝুঁকে পড়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

—নাম কী তোর?

—গোপাল স্যার, গোপালচন্দ্র মজুমদার।

—ক'দিন আছিস এখানে?

—আজ্ঞে তিন বছর হয়ে গেল।

—বয়স? পঁয়তাল্লিশ স্যার।

অমূল্যবাবু দেখলেন ফাইলে তাই লেখা আছে।

—বাড়ি?

লোকটা যা বলল তার সঙ্গে ফাইলের তথ্য হুবহু মিলে গেল।

—কেস কী?

—ফলস কেস স্যার। নিতাইয়ের মার্ডারের।

অমূল্যবাবু তাঁর প্রচলিত পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। বাজখাঁই গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন, সত্যি কথা বল। না হলে মেরে খাল খিচে নেব।

লোকটির মধ্যে কোনও ভাবাবেগ হল না। খুসখুস করে একটু কাশল বা হাসল ঠিক ধরা গেল না। একই রকম শান্ত গলায় উত্তর দিল।—সত্যিই তো বলছি স্যার। ফাইলে মিলিয়ে দেখুন।

অমূল্যবাবু বুঝলেন ঘাঘু মাল। আরও গলা চড়িয়ে দিলেন, না সত্যি বলছিস না।

—প্রমাণ করতে পারবেন স্যার?

—মেরে তক্তা করে দেব তার পর প্রমাণ।

—কেস চলছে স্যার। আসছে সপ্তাহেই কোর্ট আছে। এখন মারলে কিন্তু আপনারই প্রবলেম। শরীরে একটা দাগদুগ যদি পেয়ে যাই তাহলে আপনার ট্রান্সফার ঠেকায় কে!

জুনিয়রদের সামনে এমন অপমানিত হয়ে অবস্থা সামাল দিতে কেয়ারটেকারকে উদ্দেশ করে বললেন, ওর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি বের করা আমার বাঁ হাতের খেল, টেপ নেব, দরকার হলে ভিডিও। তারপর দেখাচ্ছি মজা।

—কোনও লাভ হবে না স্যার। কোর্টে গিয়ে বলব জোর করে বলিয়েছে, সব মিথ্যা। ধোপে টিকবে না।

অনেক দিনের অনভ্যাস। চেঁচামেচিতে অমূল্যবাবু নিজের মধ্যেই একটা অসুস্থতা বোধ করতে শুরু করলেন। ওকে সেলে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন। বুদ্ধিমান কেয়ারটেকার যাবার সময় সিলিং ফ্যানটা পাঁচে দিয়ে গেল।

দিবারাত্র অমূল্যবাবুর মনের মধ্যে একটাই চিন্তা খেলা করছে। কীভাবে প্রমাণ করা যায়, বন্দি ফাটা গোপাল আসল না। ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না। আগের জেলারই আসল জায়গায় মেরে রেখেছে। ফাইলের সব তথ্যর সঙ্গে বন্দির হুবহু মিল। আসছে সপ্তাহে কোর্টে তোলার আগে কিছু একটা করতেই হবে। দরকার হলে নিজে গিয়ে কোর্টে দাঁড়াবেন। সুযোগটা মিলে গেল। বাজারেই দেখা আসল ফাটা গোপালের সঙ্গে। একটু গোঁসা করেছে বলেই মনে হল। অমূল্যবাবু গায়ে পড়েই ভাব জমালেন। গোপালও ভাবল এবার সাহেব পথে এসেছেন। দু'জনে মিলে একটা চায়ের দোকানে বসলেন। এতদিনে অমূল্যবাবুর চেনা-পরিচিতি যথেষ্ট, ফাটা গোপালও সবারই চেনামুখ। পথচলতি মানুষজন সাপে-নেউলের দোস্তি দেখে একটু ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে। সে তাকাক, পাঁকাল মাছ ধরতে গেলে একটু-আধটু পাঁক তো লাগবেই। চা-পানের শেষে গোপালের প্রস্থান। অমূল্যবাবু ইচ্ছা করেই বসে রইলেন। গোপালের চা খাওয়া গ্লাসটা হবে মোক্ষম প্রমাণ। আসল গোপালের জ্যান্ত হাতের ছাপ। বিজ্ঞানস্বীকৃত সুতরাং কোর্ট মানতে বাধ্য।

অমূল্যবাবু ভাবলেন চায়ের দোকানের ছেলেটার সঙ্গে একটু ভাব জমিয়ে রাখা যাক। চাকরিজীবনের অভিজ্ঞতায় উনি দেখেছেন রিকশাওয়ালা ও চায়ের দোকানের বয়রাই সব থেকে মূল্যবান সোর্স হয়। কোনও গোপন বা একান্ত আলোচনায় মানুষ ওদের উপস্থিতি ধর্তব্যর মধ্যেই আনে না। বছরখানেক আগের এরকমই একটা ঘটনা মনে পড়লে অমূল্যবাবুর ফরসা গালটা এখন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। তখন বারাসাতে পোস্টেড ছিলেন। কী একটা প্রয়োজনে গিন্নির সঙ্গে রিকশা করে চাঁপাডালি যাচ্ছিলেন। স্থানীয় রিকশাচালক, সুতরাং অমূল্যবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে ভালই চেনে। সম্মান করে, আবার তার গুরুগম্ভীর স্বভাবের কারণে ভয়ও পায়।

নির্জন কোর্টের রাস্তায় পড়ে টুকরো আলোচনার মাঝে গিন্নি বললেন, বিজয়ায় একটা ভাল বই এসেছে। উত্তম-সুচিত্রার, চল না আজকে দেখে আসি।

অমূল্যবাবু বহুব্যবহৃত উত্তরটাই প্রো করলেন, এখন সময় কোথায়?

—এখনই তো সময়, ছেলেমেয়েরা বাইরে আছে।

—বলছ?

—হ্যাঁ গো, কতদিন সিনেমা দেখি না বল তো?

পুরনো স্মৃতি মনে পড়ায় অমূল্যবাবুর মনটা চনমনিয়ে উঠল, তোমার মনে আছে বিয়ের পরপর কী হারে সিনেমা দেখতাম?

—কোনও কোনওদিন দুটোও।

—হলের লোকেরাও আমাদের চিনে গিয়েছিল।

—আর তুমি যা অসভ্য ছিলে!

অমূল্যবাবু প্রাণখুলে হা-হা করে হাসতে হাসতে বললেন, সে

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রীঅমূল্য হাতি বেশ বুঝতে পারলেন তাঁর পা দুটো কাঁপছে। কী থেকে কী হতে যাচ্ছে। গত সপ্তাহেই ব্লাড প্রেসার মাপিয়েছেন। হাই ছিল। এবার দুশো ছাড়িয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

একটা দিন ছিল। তাহলে এক কাজ করি। চল সরমায় যাওয়া যাক। কী একটা হিট বই চলছে। মাধুরীর হেভি পোস্টার পড়েছে। কী যেন নামটা? ওই যে গানটা, চোলি কা...।

—খলনায়ক স্যার, হেভি ফিল্ম স্যার, দেখে আসুন। রিকশাচালক সামনে থেকে উত্তর করল।

স্ত্রী খপ করে জামার কলারটা ধরে না ফেললে অমূল্যবাবু পড়েই যাচ্ছিলেন।

এতক্ষণে অমূল্যবাবুর চা খাওয়া শেষ দেখে ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়াল, আর কিছু দেব স্যার। গরম পকোড়া আছে।

—না থাক। বস, তোর সঙ্গে একটু গল্প করি।

দোকানে আর দ্বিতীয় খদ্দের নেই। মালিক বাজারে। ছেলেটি সামনে এসে বসল।

—তোর নাম কী রে?

—মিঠুন স্যার।

—মিঠুন নাম কে দিয়েছে, জানিস?

—বাবা স্যার। ডিস্কো ডান্সার যেদিন রিলিজ করল সেদিনই আমিও রিলিজ হয়েছি, বাড়িতেই। বাবা ওপেনিং-ডে ওপেনিং-শো দেখতে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে আমাকে দেখেই নাম দিয়ে দিল, মিঠুন।

অমূল্যবাবু খেজুরে আলাপ বাড়িয়ে চললেন, তোদের এই দোকানটা কতদিনের?

—তা তো ঠিক জানি না স্যার। তবে শুনেছি যে-বছর শোলে বেরিয়েছিল, সেই বছর। শোলেও হিট, দোকানও হিট, এ দোসতি, হাম নেহি...।

—তুই কবে থেকে কাজ করছিস?

—বেশি দিন না। এই তো, কহো না প্যার হ্যায় নাইট শো মেরে ফিরছিলাম। হৃত্বিক পুরো কাঁপিয়ে দিল। আমার আবার ঝক্কাস ফিল্ম রিপিট না করলে চলে না। হাত খালি। সট্ করে ঢুকে পড়লাম এই দোকানে। মালিককে ডাইরেক্ট চেস্ করলাম, চাকরি আছে? মার গুড় দিয়ে রুটি, হিট হয়ে গেল।

—এখন তো ফিল্মটিল্ম দেখতে পারিস না।

—পারব না মানে। আগে বেস্পতিবারে ছুটি দিত, ওই দিন বাজার বন্ধ থাকে বলে। আমি শালা মালিককে পটিয়ে ওটা শুক্কুরবার করে নিয়েছি। ওপেনিং-ডে ওপেনিং-শো না মারলে তো কেস বিলা। বাসি কচুরি, বাসী চাটনি মারো, ওয়াক থু। আমজাদ স্টাইলে থুতু ফেলতে গিয়ে গিলে নিল।

অমূল্যবাবু স্বগতোক্তি করলেন, ওপেনিং-ডে ওপেনিং-শো, জিন ক্যারেক্টর। বুঝলেন সিনেমার ওপর ভাল ডেপথ না থাকলে ওর সঙ্গে কথা বাড়ানো মুশকিল। উঠতে উঠতে গোপালের চায়ের গেলাসটা রুমালে জড়িয়ে হাতে নিয়ে বললেন, এ হাত নেহি, ফাঁসি কা ফান্দা। বুকলি কিছু?

মিঠুন ঘোড়ার মতো হিঁহিঁ করে একটা হাসি দিয়ে বলল, বুঝেচি স্যার। নিয়ে যাবেন। অনেকেই যাচ্ছে স্যার, ধরতে পারি না। কিন্তু আপনি হেভি ভদ্দরলোক তো, তাই বলে...।

—নিচ্ছি, তবে পুরো দাম দিয়ে। সব মিলিয়ে কত হল বল।

মিঠুন দাঁতে জিভ কেটে কুতকুতে চোখে বলল, ছি ছি, দাম লাগবে না স্যার। দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে তো তার আবার দাম কীসের। দিয়ে দেব।

অমূল্যবাবু মনে মনে খুশিই হলেন তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে দেখে। তবুও যে কন্সাইন্সের চোরা ঢেকুরটা ঠেলা মারতেই বললেন, দাম তোর নিতেই হবে। কত হল বল।

—দাম তো নেবই তাই বলে আপনার কাছ থেকে?

—কেন, আমি জেলের অফিসার বলে?

—তার জন্য না স্যার। আপনি গোপালদার সঙ্গে এসেছেন। গোপালদাই সব দাম দিয়ে দেবে। আপনার কাছ থেকে পয়সা নিলে গোপালদাকে অসম্মান...।

অমূল্যবাবুর কলজে ধক-ধক করে উঠল, আর কথা না বাড়িয়ে হাঁটা লাগালেন। মিঠুনের পরের কথাগুলো আর কানে ঢুকল না তাই হৃৎপিণ্ডটা এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেল।

কোর্টে যথারীতি অমূল্যবাবু আসল গোপালের হাতের ছাপ ও চায়ের গেলাসটা প্রদর্শিত করলেন। এবার নকল গোপালের রহস্য ফাঁস হবে ভেবে বেশ উৎফুল্ল। অনেস্ট অফিসার বলে এমনিতেই নামডাক ছিল। এবার একটা ইনিশিয়েটিভের জন্য পদক-টদক মিলে যেতে পারে।

বিচারপতি প্রমাণ দুটো নেড়েচেড়ে দেখার মাঝেই আসামি পক্ষের আইনজীবী প্রার্থনা করলেন যে উনি অমূল্যবাবুকে জেরা করতে চান। বিচারকের সম্মতি পেয়ে প্রশ্ন, এটা যে আসল গোপালের আঙুলের ছাপ তার প্রমাণ?

—প্রমাণ তো চোখের সামনেই। আমি নিজে হাতে সংগ্রহ করেছি।

—আমি যদি বলি ওটা মিস্টার হরিপদর হাতের ছাপ, তাহলে আপনি কী বলবেন?

—কী আবার বলব, আপনি মিথ্যা বলছেন?

—আপনি মিথ্যা বলছেন মিস্টার অমূল্য হাতি। আসামি পক্ষের আইনজীবী চিৎকার করে উঠলেন। আপনি কোর্টকে বিভ্রান্ত করছেন। আমার মক্কেল তিন বছর জেলে আর আপনি মিথ্যা তথ্য দিয়ে অকারণে একজন নিরপরাধীকে ফাঁসাচ্ছেন।

—না, আমি নিশ্চিত যে জেলের গোপাল আসল গোপাল নয়। আসল গোপাল বাইরে আছে।

—এইবার পথে আসুন মিস্টার হাতি। আপনি বলছেন জেলে যাকে আটকে রেখেছেন সে আসল গোপাল নয়।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আইনজীবী বিচারপতিকে উদ্দেশ করে বললেন, দিস পয়েন্ট শুড বি নোটেড। তারপর অমূল্যবাবুর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন তাহলে বলুন একজন নিরপরাধ লোককে আসামি করে তিন বছর কেন জেলে আটকে রেখেছেন। কী তার অপরাধ? এটা কি মানেন যে কোনও নিরপরাধ ব্যক্তি যদি আপনার আন্ডারে দিনের পর দিন জেল খাটে তবে আপনি তার দায় এড়াতে পারেন না?

অমূল্যবাবু আমতা আমতা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের শেষ চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমার আগে থেকেই তো...।

আইনজীবীর ধমকে অমূল্যবাবুর অর্ধেক কথা মুখেই আটকে গেল, অন্যের দোষের বিচার করা আপনার কাজ না, তার জন্য মহামান্য বিচারপতি রয়েছেন। আপনি শুধু বলুন যে আপনি কি দায় এড়াতে পারেন!

অনেক চেষ্টা করেও অমূল্যবাবুর গলা দিয়ে কোনও স্বর বের হল না।

অমূল্যবাবুর নীরবতার সুযোগ নিয়ে আবার গোপালের আইনজীবী প্রশ্ন করলেন। একজন নিরপরাধ লোককে একদিন-দু'দিন না তিন তিনটে বছর আটকে রাখার শাস্তি কী আপনি জানেন! আমি মহামান্য বিচারপতির কাছে আবেদন করব এর উপযুক্ত শাস্তি মিস্টার হাতিকে দেওয়া হোক, আর সেটা কমপক্ষে তিন বছরের হাজতবাস।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জেলার শ্রীঅমূল্য হাতি বেশ বুঝতে পারলেন তাঁর পা দুটো কাঁপছে। কী থেকে কী হতে যাচ্ছে। গত সপ্তাহেই ব্লাড প্রেসার মাপিয়েছেন। হাই ছিল। এবার দুশো ছাড়িয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

গোপালের আইনজীবী আবার তাঁকেই উদ্দেশ করে গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, তাহলে, মিস্টার হাতি! ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বলুন যে, যে-লোকটা হাজতবাস করছে সে আসল গোপাল না নকল?

এবার আর অমূল্যবাবু সময় নিলেন না। আমতা আমতা করে বললেন, মনে হচ্ছে আসলই হবে। আমার বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছিল।

—দিস পয়েন্ট অলসো শুড বি নোটেড। আইনজীবী এবার বিচারপতির দিকে ফিরে বললেন, মহামান্য আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা, আমার মক্কেল যে দোষী সেটা বাদীপক্ষ প্রমাণ করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদারকে এখনই বাইজ্জত মুক্তি দেওয়া হোক। আর উনি নিরপরাধ হয়েও

বন্দি অবস্থায় যে নিগ্রহ ভোগ করছেন সেই কারণে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হোক। আর মহানুভব শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার, তাঁর এই অকারণ হেনস্থার জন্য যাঁরা দায়ী সেই জেলার সাহেব ও অন্যান্যদের ক্ষমা প্রদর্শনে সম্মত হয়েছেন।

ফাটা গোপালের ক্ষমায় কাঠগড়া থেকে মুক্তি পেয়ে অমূল্যবাবু সামনের বেন্‌চে এসে বসলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিচারক তাঁর রায় শোনালেন। আর এক সপ্তাহ সময় দিয়েছেন। তার মধ্যে খুনের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারলে গোপালের মুক্তি। সঙ্গে ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা যেটা জেলার ও অন্যান্য দোষী জেল ও পুলিশকর্মীদের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে।

জেলার অমূল্যবাবুর মুডটা কয়েকদিন ধরে খিঁচিয়ে আছে। যাকে-তাকে অকারণে গালিগালাজ করে ফেলছেন। তাঁর জীবনে এরকম পরাজয় আগে কখনও আসেনি। শুধু পরাজয়, আর একটু হলে হাজতবাস কপালে নাচছিল। সন্ধ্যার সময় বিমর্ষভাবে অফিসে বসে আছেন এমন সময় কেয়ারটেকার এসে জানাল গিরগিটি গোপাল একটু দেখা করার আর্জি জানিয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমূল্যবাবু মত দিলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হাজতের গোপাল এসে টেবিলটার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

—স্যার, বড় বিপদে পড়েছি স্যার।

অমূল্যবাবু মুখ তুলে তাকালেন। কাতর মুখে গিরগিটি গোপাল হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে মায়াও হল। সত্যিই তো নিরপরাধ লোকটা পেটের দায়ে এতদিন জেল খাটছে।

—আবার কী বিপদ হল?

—স্যার, আসছে হপ্তায় তো ছাড়া পেয়ে যাব।

—তা তো ভালই। বিপদটা কী বল?

—ওটাই তো বিপদ স্যার।

অভিজ্ঞ জেলার রহস্যের গন্ধ পেলেন।

—কী রকম?

—ছাড়া পেলে খাব কী? এতদিন তো মাসে মাসে তিন হাজার পাচ্ছিলাম। বউটা, ছেলেটার ভালই চলে যাচ্ছিল। ছাড়া পেয়ে যে গতর খাটিয়ে খাব সে শরীরও তো নেই। না খেয়ে মরব স্যার।

—তা আমি কী করব?

—আপনিই সব পারেন স্যার। এরকম হেরে যাবেন? শেষ একটা চেষ্টা করুন না স্যার।

এরকম নিম্নশ্রেণির একজন কয়েদির মুখে হেরে যাবেন কথাটা অমূল্যবাবুর পিঠে চাবুকের মতো আঘাত করল। কড়া গলায় ধমকে উঠলেন।

—যা বলার সরাসরিই বল। তোর সঙ্গে খোশগল্প করার মতো সময় নেই।

ধমক খেয়ে গিরগিটি গোপাল আসল কথায় চলে আসল।

—আমার একটা বুদ্ধি এসেছে স্যার।

—কী বুদ্ধি!

—নেক্সট দিন কোর্টে গিয়ে আমি জজসাহেবের সামনে স্বীকার করব যে আমি আসল না, নকল। গোপালই আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে গোপাল সাজিয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করেছে। ওরা তিন দিত আপনি না হয় আড়াই দেবেন। বেশি দিন না, ছ' মাস মাত্র। কী করব আর তো কোনও উপায় নেই। ছ' মাস না হয় চলুক, তার মধ্যে অন্য কেস পেয়ে যাব, আবার এখানে চলে আসব স্যার।

—তাতে আমার লাভ?

—আমি ছাড়া পাব, আপনি তখন লোকাল থানার হেল্প নিয়ে আসল গোপালকে অ্যারেস্ট করতে পারবেন। আপনাদের কাছে ওটা তো কোনও ব্যাপারই না, খবরটা আমিই দিয়ে দেব। তিন-চারটে ভ্যান নিয়ে গিয়ে ঘিরে ফেললেই হবে। তারপর আবার নতুন করে কেস শুরু হবে। ডবল কেস। আগেরটা তো আছেই ,সঙ্গে সরকারের চোখে ধুলো দেবার কেস।

এত সহজ ব্যাপারটা মাথায় আসেনি ভেবে অমূল্যবাবু অবাক হলেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, এটা তো তাঁর মতো জেলারের প্রথম পাঠ হওয়া উচিত। টাকার টোপটা তো গিরগিটি গোপালকে আগেই দিতে পারতেন। তাতে তাঁর এরকম হেনস্থা হতে হত না।

বহুদিন পর কান এঁটো করা হাসিটা মুখের কালো মেঘ সরিয়ে ভেসে উঠল, অমূল্যবাবু গিরগিটি গোপালকে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, তোর তো দারুণ প্রতিভা রে! এই লাইনে না এলে নামকরা জেলার হতে পারতিস। বস বস। সব প্ল্যান প্রোগ্রাম পাকা করে নিই।

কেয়ারটেকার কিছুক্ষণের মধ্যেই অমূল্যবাবুর প্রিয় সান্ধ্য জলখাবার একথালা মুড়ি লঙ্কা পিঁয়াজ রেখে গেল। যাবার আগে পাখাটা পাঁচ থেকে তিনে দিয়ে দিল।

কোর্টে গিয়ে গিরগিটি গোপাল ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদেকেটে স্বীকারোক্তি দিল। হিসেবমতো তার মুক্তি হয়। কিন্তু ফেঁসে যান অমূল্যবাবু। কোর্টে দাঁড়িয়ে গত সপ্তাহে দুই রকম স্বীকারোক্তি দেবার ও কোর্টকে বিভ্রান্ত করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন। বিচারপতি বিচার শেষ করেন তিনটি আদেশ জারি করে।

১. নকল গোপালের মুক্তি। ২. আসল গোপালকে শীঘ্রই গ্রেফতার করা ও নতুনভাবে বিচার শুরু করা। ৩. গত সপ্তাহে আদালতে দাঁড়িয়ে দুই ধরনের বিবৃতি দিয়ে আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টার অপরাধে অমূল্যবাবুর তিন সপ্তাহের হাজতবাস।

নতুন জেলার জেলের দায়িত্ব নিয়েছেন। অমূল্যবাবুকে চেনেন। এক সময় অমূল্যবাবুর আন্ডারে চাকরিও করেছেন। এখন তাঁরই আন্ডারে অমূল্যবাবুর জেল খাটতে হবে এটা দু'জনের ক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক।

প্রথম দিনই কেয়ারটেকারকে ডেকে বললেন, যান অমূল্যবাবুকে সেল থেকে আমার চেম্বারে নিয়ে আসুন। দেখবেন, ওনার কোনও অসম্মান যেন না হয়।

কেয়ারটেকার আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু স্যার, সবে এসেছেন একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করে...।

—আপনাকে যা বলছি তাই করুন, কড়া স্বরের নির্দেশ।

একটু পরে কেয়ারটেকারের সঙ্গে অমূল্যবাবু এসে জেলারের টেবিলের সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। জেলার চোখ তুলে দেখলেন— বয়স কম করে পঞ্চান্ন হবে। বড়জোর সাড়ে চার ফুট হাইট। হেরোইন আর চোলাইতে শরীরের দফারফা হয়ে গিয়েছে। হাড়জিরজিরে চেহারার ঘাটের মড়া। কপালে কমলার কোয়ার শেপের কাটা দাগ। চোখগুলো কলকাতার বাজারের পাবদার মতো।

চোখ নামিয়ে বন্দি শ্রীঅমূল্য হাতির ফাইলে চোখ রাখলেন। সব কিছু হুবহু মিলে যাচ্ছে।

সুব্রত হালদার

জন্ম ১৯৬২। ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার। বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত। শখ লেখালিখি, ছবি আঁকা, সফটওয়্যার রচনা। গত তিন-চার বছর মন দিয়ে সাহিত্যচর্চা করছেন। 'আনন্দমেলা' সহ বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত হয়েছে।